ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

আহমদ ছফার সূর্য তুমি সাথী উপন্যাসে ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্ব

রওশন জাহিদ*

Abstract: The fiction *Surya Tumi Sathi* was written at the sixth decades of last century by Ahmod Sofa. An ideological man with political awareness he applied the historical meaterialistic method in this fiction. But he did it so spontaneously because in his creations society reflected by the human beings. By any judgement it could be said that *Surya Tumi Sathi* is a successful creation.

ভূমিকা

নিরন্তর সংগ্রামের বহুমুখিনতা, কালের প্রলেপ, সামাজিক সংঘবদ্ধতার প্রাণান্ত প্রয়াস আর মানবিক গুণাবলির নানা বিষয়ে সাহিত্যের প্রতি সমাজের দায়বোধ এড়ানোর কোনো রকম প্রয়াসই সাধারণত কার্যকর হয় না বা হতে পারে না। কারণ সামাজিকতার নানাবিধ উপস্থাপনের বিবিধ ভাব-ভঙ্গি সাহিত্যের করতলগত। সাহিত্যস্রষ্টা, সে কথাসাহিত্যিক কিংবা কবি যে-ই হোন না কেন, প্রকাশ করেন এক অমোঘ সত্য যা সত্যের চেয়ে বেশি সত্য সামাজিকতার নিরিখে। *কথাসাহিত্য এমন একটি শিল্প যার আধারে রোমান্টিক কবির দৃষ্টিকোণও সামাজিক বস্তু-ভিত্তি খুঁজে নেয়।*[১] কারণ সমাজই তার কাহিনীর বিষয়। সমাজ নিয়ন্ত্রণে যে পুঁজি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়, সমাজে সে পুঁজি গমনাগমনের পথ, বাহন আর সামাজিক ফলাফলও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সমাজ, পুঁজি, সামাজিক মানুষ, তার চিন্তা-চেতনা, জীবন-যাপনের প্রয়াস সব কিছুই তাত্ত্বিকতার মাত্রাগুণে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আর সেগুলির সম্পর্কও অঙ্গাঙ্গী। কারণ ব্যক্তি বিশেষের সমষ্টিই সমাজ। জীবনের কথাই সমাজের কথা। *উপন্যাস হলো মানুষের জীবনের গদ্য। উপন্যাস হলো মানুষকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার এবং তাকে প্রকাশ করার প্রথম নান্দনিক প্রচেষ্টা।*[২] ঔপন্যাসিক *আহমদ ছফা* তাঁর *সূর্য তুমি সাথী*তে সমাজ কাঠমোর ভিতর-বাহির, অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপায়-সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়াদির সমন্বয়ে সমাজ অর্থনীতি পরিবর্তনের চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় গল্প সামাজিক চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি নির্ভর গ্রামীণ সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি-সম্পর্ক-নিয়ামক প্রভৃতি বিষয়ের বোঝাপড়া যে জটিল সমীকরণে বিস্তৃত তা এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামন্তীয় মনোভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগের নগ্ন প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণ করা গবেষণার উদ্দেশ্য।

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক লেখক *ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্ব*কে তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে *আহমদ ছফা* অন্যতম। *আহমদ ছফার হেড মাস্টার ছিলেন শ্রী বিনোদ*

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

বিহারী দত্ত। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই সুধাংশু বিমল দত্তের মাধ্যমে কৃষক সমিতি ও তখনকার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। আর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করার উৎসাহ জোগাতেন তাঁর পিতা। এ-সময়ই তরুণ বয়সের রোমান্টিক বিপ্লবী উন্মাদনায়, সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা কয়েক বন্ধু মিলে চট্টগ্রাম দোহাজারী রেললাইন উপড়ে ফেলেন।[৩] ঐ সময়ের বর্ণনায় তিনি নিজে বলেছেন, *আমরা থাকতাম কানুনগো পাড়ায়। ঐ এলাকার লোকগুলো অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলো, এবং আমরা যে থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া করেছিলাম লোকনাথ বলের বাড়ি, বিপ্লবী। উই ওয়ান্টেড এন এডভেঞ্চার। ....তখন জেলে ছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, আবুল মনসুর। আমাদের ওখানে চট্টগ্রামের যারা লেফটিস্ট, কমিউনিস্ট তারা সবাই থাকতেন, আমি ছিলাম সবচেয়ে ইয়ংগেস্ট।*[৪] প্রগতিশীল মানসিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে তিনি যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি তাত্ত্বিকতার জগৎ থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন যা তাঁর বাস্তববাদী জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের চিন্তাকে উস্কে দেয়। তাঁর রচিত সাহিত্যে গুঢ় তাত্ত্বিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার কারণে প্রবন্ধটিতে *আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি* ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় আধেয় হিসেবে *আহমদ ছফা* রচিত *সূর্য তমি সাথী* উপন্যাস পরিগণিত। প্রাথমিক তথ্যের আকর হিসেবেও উপর্যুক্ত বইটিই ব্যবহৃত হয়েছে। গৌণ তথ্যের উৎস হিসেবে *আহমদ ছফা* রচিত সাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি এবং *ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্বে*র পরিচিতি ও ব্যাখ্যামূলক বই ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষণীয়।

তাত্ত্বিক কাঠামো

কার্ল মার্কস ও *ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসে*র ভাবনা-চিন্তা এবং তাদের ভাবনা-চিন্তার আলোকে মার্কসবাদীদের নিরন্তর ভাবনা-চিন্তা তত্ত্বীয় দিক দিয়ে মার্কসবাদ বলে পরিচিত। সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লব নির্ভর সংগ্রাম রাজনৈতিকভাবে মার্কসবাদ। *বর্তমান আলোচনার সুবিধার্থে মার্ক্সবাদ বলতে আমরা বুঝব: (ক) একটি দর্শন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদ্যমান মানব সমাজ, এবং ভবিষ্যতের মানব সমাজ (কী হওয়া উচিত), (খ) একটি তত্ত্ব সমগ্র যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের স্বরূপ এবং (গ) বিশ্লেষণ করার, ও সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর একটি পদ্ধতি।*[৫] মার্কসবাদ সমাজের স্বরূপ যেমন বিশ্লেষণ করতে পারে তেমনি ভবিষ্যতের সমাজ কাঠমোর ধরন সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দিতে পারে। অর্থাৎ সমাজ রূপান্তরের ধারা বিশ্লেষণেও সক্ষম।

বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে খাদ্য উৎপাদন, উৎপাদিত খাদ্যের বিধি-ব্যবস্থা ও শ্রম বিভাজনের মতো বিষয়কে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে কাজ করার প্রবণতা একমাত্র মানুষেরই আছে। উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক ক্রমেই জটিলতর এক বন্ধনে যুক্ত হয়ে যায়। পুরো বিষয়ের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ক্ষমতা দায়ী। এই দায়ী হওয়ার প্রবণতা সমাজ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রবাহিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদন ও অর্থনীতি গুঢ়তম সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও সমাজ হয়ে ওঠে এই সম্পর্কের মূল যোগসূত্র। আর মানুষ যোগাযোগের বাহন। অর্থনীতি পরিচালিত হওয়ার স্বার্থে সমাজ এবং সংস্কৃতি এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন ও বিবর্তনের নানা ঘুরপথ অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে যার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকে কাল। পুরো প্রক্রিয়ায় কিছু বিষয় থাকে যা অর্থনৈতিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক, সেগুলি ভিতরি কাঠামো বলে পরিচিত। আর সাংস্কৃতিক নিয়ামকগুলি উপরি কাঠামো। ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্বের মূল কথা এরকমই। মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণি ইতিহাসের মূল প্রবণতাগুলি বিভিন্ন

বৈশিষ্ট্যের আলোকে পরিচিত সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের রাজনীতি নির্ভর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাসমূহ নিজেদের আয়ত্ত্বে নেওয়ার প্রচেষ্টা।

মূল আলোচনা

যে জীবনে জীবন বাঁচানোর তাগিদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থ, যে জীবনের সম্পর্কগুলি নির্ণীত হতে থাকে সম্পদের আলোকে, যে জীবনে মানবিকতার বোধ ভূলুণ্ঠিত হয়, সে জীবনে পুঁজি আষ্টেপৃষ্ঠে আসন গেঁড়ে বসে। কাঠুরে *হাসিম* সহজ জীবন যাপন করত। প্রকৃতি ছিল তার প্রিয়। অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজের চেয়ে সে পাহাড়ে কাঠ সংগ্রহ করতে যেতে ভালবাসত। কারণ মানুষ মানুষের প্রতি বিমুখ হতে পারে কিন্তু প্রকৃতি দু'হাত প্রসরিত করে তার বাহুতে স্থান দিয়েছে মানুষকে। *হাসিম* যখন কাঠের টুকরা মানুষের হাতে তুলে দেয় টাকার জন্য তখন সেখানে আর কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমনকি যে সমাজে *হাসিম* বাস করে সে সমাজের একজনও *হাসিমে*র বাড়িতে ভাত রান্না হবে কি হবে না সে খোঁজ রাখে না। আফসোস ছাড়া *হাসিমে*র কিছুই করার নেই। *ফোরম্যানের বউ একভার লাকড়ি নিয়েছিল। আজ টাকা দেবার কথা। টাকা দিলে চাল কিনে ভাত রান্না করত। টাকা দেয়নি রান্নাও চড়েনি। তামাকের নেশা আর তার নেই। দু'হাতে মাথা ঢেকে চুলোর ধারে বসে পড়ে। ক্ষুধাটা দ্বিগুণ মালুম হয়। রান্নাঘরের হাঁড়ি-পাতিল তাকে দেখে যেন বিদ্রুপ করছে।*[৬]

বসবাসের জন্য প্রায় দুরূহ একটি সমাজে *হাসিমে*র বসবাস। সামাজিকভাবে এই সমাজে বসবাস করা তার জন্য কষ্টের হলেও বিষয়টা সত্য যে সামাজিক অসমতার যে নৈমিত্তিক যন্ত্রণা সে ভোগ করে সেসবের পূর্বসুরি ছিল তার জন্মদাতা পিতা। *হাসিমের মনে চিন্তা..........একমুঠো ভাতের চিন্তা।*[৭] *হাসিম* তার সমাজভুক্ত সকল মানুষকে ভালবেসে সমাজে বাস করতে চায় কিন্তু অনেকেই বিদ্রুপ করতে ছাড়ে না। নিরন্তর পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল যে জীবন *হাসিমে*র তাতে জীবন বাঁচানোর তাগিদ অনেক বড়। তাইতো সে ভাতের চিন্তা করে।

অভাব, দুঃখ, নির্যাতন, উপবাস থেকে মুক্তি পাবার আশায় শীতজর্জর পৌষের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে গাছের ডালের সঙ্গে এক মাথা, দড়ির আরেক মাথা নিজের গলায় পরিয়ে ধাক্কা দিয়ে মইটা ফেলে ঝুপ করে ঝুলেছিল মুক্তির আশায়। হাসিমের এখনো চোখের সামনে ভাসে তেজেনদার চিরতরে নির্বাক হয়ে যাওয়া চোখের সে স্বপ্নিল দৃষ্টি।[৮] উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে কখনোই কোনো সংলাপ বলেনি, এমনকি শুরুর দৃশ্যে তার যে উপস্থিতি তাতে কোনো বক্তব্য দেয়ার সুযোগও দেননি ঔপন্যাসিক। চরিত্রটির নাম *তেজেন*। উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে লেখক একটি দৃশ্যকল্প রচনা করেছেন *তেজেনে*র আত্মহত্যার বিষয়ে। শারীরিকভাবে অত্যন্ত বলশালী *তেজেন* হেরেছে পুঁজিবাদের কাছে। জীবনের প্রতি ভীষণ হতাশার বোধ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সে নিজেকে গাছের ডালে ঝুলিয়েছিল। এই দৃশ্য প্রথম দেখে *হাসিম*। *হাসিম* চরিত্রটি হচ্ছে উপন্যাসের কেন্দ্রভাগের একটি চরিত্র। জীবন যাপনের সংকটাপন্ন অস্বাভাবিকতার বোধ, সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার-অসমতা-সমস্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করা একটি চরিত্র *হাসিম*। লেখক *তেজেন* চরিত্রের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আদর্শগত সাফল্যের একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করেছেন। যদিও যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের সংগ্রামের কথা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি তা আদতে উপন্যাসের শেষে শিল্প বিপ্লবের কোলে স্থান নিয়েছে। তবে তেজেনের চোখে এক ধরনের স্বপ্ন ছিল যা অন্যদের সামনের পথে নিয়ে যেত। মারা যাবার পরও *তেজেনে*র দৃষ্টির সে শক্তি হারিয়ে যায়নি। লেখক সুকৌশলে সে দৃষ্টির উত্তরাধিকারী করেছেন *হাসিম*কে। *তেজেনে*র মৃত্যুর দৃশ্যকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক শীত ঋতুকে বেছে নিয়েছেন। কারণ শীতকালে প্রকৃতি থাকে নিঃসাড়, নির্জীব ও জুবুথুবু। লেখক এই

সময়কে মানিয়ে তুলেছেন *তেজেন* চরিত্রের সাথে আর তারপরেই তিনি *হাসিম* চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। যেন সে শীতের তীব্রতা উপশমকারী ও গ্রীষ্মের অগ্রনায়ক। পরবর্তী দৃশ্যে *হাসিম* চরিত্রের উপস্থাপন তাত্ত্বিকভাবে আশাব্যঞ্জক।

*হাসিমে*র বাবা কাজী পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করার জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু ছলনার কারণে কাঙ্ক্ষিতাকে পাননি আপন করে। পেয়েছিলেন ঐ পরিবারের দাসীকে। তাতে তার যে সম্মানহানি হয়েছিল সেই ভার এখনও বয়ে বেড়াতে হয় *হাসিম*কে। *ঝিলিক মেরে চোখের সামনে তেজেনদার চোখ দুটো ভেসে উঠল। মৃত নিথর চোখের ছুরির ফলার মতো অন্তরের অতলস্পর্শী জিজ্ঞাসাটি হাসিমকে ডাক দিয়ে অনেক দূরে নিয়ে যায়।......... কিছু দেখতে পায় না। কেবল দেখে হাতির মতো বলশালী তেলিপাড়ার তেজেনের বাঁকানো দৃষ্টি হাজার হাজার ভগ্নাংশ হয়ে মিশে গেছে।*[৯] *হাসিম* আশ্রয় খোঁজে *তেজেন* চরিত্রের মধ্যে। কারণ *তেজেনে*র চোখে মুক্তির যে আভা আছে তাতে সামাজিক বাধা বিপত্তি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। ফলে *হাসিম* শান্তি পায়। তার মনে হয় যেন ঐ আদর্শের কথা হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এবং ঐ খারাপ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবেই।

জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত লাভের প্রতি উদাসীন *হাসিম*। অবশ্য তার একটা গ্রহণযোগ্য কারণও আছে। সামাজিক মানুষেরা তাকে তার বাবার কৃতকর্মের জন্য নানা কটু কথা বলত। তাই *হাসিম* মানুষের চেয়ে পাহাড়কেই বেশি ভালবাসত। *দিনমজুরি তিনবেলা খেয়ে আড়াই টাকা তিন টাকার নিচে না। হাসিম পাহাড় থেকে বাঁশ এনে দু'টাকার বেশি পায় না। তার বোকামির জন্য লোকে হাসে।......পাহাড় তাকে কষ্ট দেয় বটে, সে কষ্ট কিছুতেই মানসিক নির্যাতনের সমান নয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হৃদয়কে রক্তাক্ত করতে জানে না ধ্যানী মৌনী নীলশৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়।*[১০] *হাসিম* মনে করে পাহাড় থেকে পড়ে গেলে যে শারীরিক ক্ষতি হয় তা সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মানসিক ক্ষতি সারানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। আত্মকেন্দ্রিক নয় এমন চরিত্র *হাসিম* অর্থের পরিমাণ বিচারে দিনমজুরি শ্রেয়তর হলেও তাতে রাজী হয় না। কারণ সে প্রকৃতিকে ভালবাসে আর প্রকৃতিও তাকে কখনও ঠকায়নি। তাই *হাসিম* চরিত্রের মূল সুর যে ইতিহাসের বস্তুগত বিষয়াদি তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

মনের গভীর সঙ্গোপনে ক্ষীণ স্পষ্ট একটি আলোক শিখা জেগে ওঠে। এই চেতনাই তার হাতিয়ার। এরই আলোকে পথ দেখে দেখে অত্যাচার আর অবিচার সয়ে সয়ে সে এত বড় হয়েছে। হাসিম স্পষ্ট দেখতে পায়, মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা আর ভণ্ডামীর সীমা কতদূর। নিজেকে সমগ্র নির্যাতিত মানব জাতির প্রতীক বলে মনে হয়। চেতনার শিখা আরো প্রোজ্জ্বল, সন্ধানী রশ্মি আরো তীক্ষ্ণতর হয়। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো শৃঙ্খলকে চোখের সামনে তুলে ধরে। নিজের অস্তিত্বের চারপাশের দেয়ালটাকে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। শরীর উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়, মাথায় ছলাৎ ছলাৎ রক্ত ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে: "এই দেয়াল আঁই ভাইঙ্গম!"[১১] *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র *হাসিম* নিজেকে কখনোই কাহিনীর কেন্দ্রানুগ ভাবেনি। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। উপন্যাসের পুঁজিবাদী চরিত্রগুলিকে লেখক ঘটনার পরম্পরায় *হাসিমে*র সামনে উন্মুক্ত করেছেন। পুঁজিবাদী ঘরানার প্রতিটি ঋণাত্মক চরিত্রকেই তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন চরিত্রগুলির কথাবার্তাতেই করাল থাবা সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়ে যায়। *হাসিম* প্রতিটি চরিত্রকেই তার অবস্থান থেকে মূল্যায়নের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্যাতিত নিপীড়িত *হাসিম* চরিত্রকে লেখক যেমন ধনাত্মক ভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন তেমনি অন্য ঋণাত্মক চরিত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের নির্মমতাকে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। অর্থাৎ লেখক খুব সহজে একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে পেরেছেন। আর তাই লেখক সামনের দিনের কথাও *হাসিমে*র মুখ দিয়ে বলাতে পেরেছেন। পৃথিবীর অত্যন্ত আশাবাদী চরিত্র যেমন যে-কোনো মহাবিপর্যয়ের মধ্যেও টানেলের শেষ মাথায় আলোর রেখা দেখতে পান তেমনি লেখক

পুঁজিবাদের পতন সম্পর্কে ধারণা দিতে চেয়েছেন। পুঁজিবাদের প্রায়োগিক দিক কর্পোরেট বাণিজ্যের যে দেয়াল মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পঙ্কিলতা ও কলুষতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে লেখক তার কেন্দ্রীয় চরিত্র *হাসিম*কে দিয়ে তা উপড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে দেয়াল পুঁজিবাদের শক্তি সামর্থ্যের সাহায্যে আরও বেশি মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল সে দেয়ালের গাঁথুনির ইট সম্পর্কে সামাজিক মানুষেরা জানে। মেকি সমাজ কাঠামোর পুরুষ্টু সামাজিক নিয়ম সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারগুলিকে বোবা করে রাখে। ফলে সামাজিক পরিবর্তনশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতার নিয়ামকগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনিভাবে সমাজ পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে পুঁজি। *ফুলশয্যার রাতে গলায় বেনারশি শাড়ি দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল জরিনা। সে অব্যক্ত বেদনার গুরুভারও তার বাপকে সইতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, কাজী বাড়ির দাসী বিয়ে করে দাস হিসেবে জিন্দেগী কাটাতে হয়েছে।.......বান্যা পুকুরের বটগাছে লটকানো তেজেনদার চোখের জিজ্ঞাসার ছুরি তার বাপের মর্মে আমূল বিঁধে গিয়েছিল যেন। একবার আহা করবার সুযোগও পায়নি। অতীতের ছায়ামূর্তিগুলি তার সামনে নির্দিষ্ট গতিপথে নিজের নিজের ভঙ্গিতে প্যারেড করে যেন চলে গেল। সকলে মিলে তার জীবনের যে গতিপথ নির্দিষ্ট করেছে, সে পথেই তাকে আমরণ হাঁটতে হবে। নির্দিষ্ট গন্ডি ভেদ করে কোনদিন সে উদার আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতে পারবে না। নিজের অস্তিত্বের চারপাশে দেয়ালের মতো নিরেট কঠিন বাধা অনুভব করে। হাজার আঘাতেও পথ দেবে না।*[12] *হাসিমে*র বাবা কাজী বাড়ির মেয়েকে বিবাহ করার জন্য নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল। ফলে সে হয়েছিল পরিবার পরিজনহীন। আবার কনেপণ স্বরূপ স্বর্ণালংকারসহ নগদ টাকাও দিতে হয়েছিল। ফলে সে নিঃস্ব হয়েছিল। অর্থাৎ *হাসিমে*র বাবা কাজী পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করার আশায় পরিবারহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সে আশায় গুড়ে বালি। কাজী বাড়ির লোকজন ছলনার মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিতার সঙ্গে অন্য লোকের বিয়ে দেয় এবং একই দিনে কাজি বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ দেয় যা তার জাত-পাতের পরিচয় হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে। কিন্তু কখনোই তিনি প্রতিবাদ করতে পারেননি। কারণ যাদের হাতে সমাজ শাসনের দন্ড তারা কথা শোনেনি তার। তাই *হাসিম* মৃত *তেজেনে*র মুখাবয়বে তার বাবার সারা জীনের করুণ আর্তি অনুভব করে। সে আশা করে কিন্তু ধনাত্মকভাবে ভাবতে পারেনা যে, সে কি আদৌ এই দেয়াল ভাঙতে পারবে যা তাকে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করছে।

কাজী পরিবারের বাঁদির গর্ভে সে জন্মলাভ করেছে। একথা কেউ যেন তাকে ভুলতে দেবে না।..... কাজী বাড়ির গৌরব, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবকিছুর বিরুদ্ধে তার মনে ধারালো বিদ্বেষ রেখায়িত হয়।[13] লেখক পুঁজির মাধ্যমে সামন্তবাদী চরিত্রের বিকাশ দেখাতে গিয়ে কাজী পরিবার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন। তিনশো বছর আগের যে *ইউসুফ কাজী* গ্রামের বিচার-আচার করত, বাইশ গ্রামের জায়গিরদারি ছিল তার হাতে, তার উত্তরসুরিরা কোনো রকমেই যে পরাস্ত হতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারে না। কিন্তু আসলে পুঁজি যেমন চিরস্থায়ী নয়, তেমনি সামাজিক সম্মানও চিরকালের নয়। শরীরে রক্তের জোয়ার যেমন কমে আসে যৌবনের পড়ন্ত বেলায় তেমনিভাবে নির্যাতিত শরীরের বিষিয়ে ওঠা রক্তও চাগিয়ে ওঠে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে। তাই *কাজী গোলাম কাদেরে*র আর্তিময় বাক্য শুনতে খারাপ লাগে *হাসিমে*র। কাজী পরিবারের যে ছলনায় তার বাবার জীবনটা বিষিয়ে উঠেছিল তার প্রতিশোধ নিতে চায় সে।

পুঁজির প্রভাবে সমাজ কাঠামোর ভিতরে একটি সামাজিক খোলশ তৈরি হয়ে থাকে। খোলশের ভিতরে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ নিজেকে শক্তিমত্তার আধার মনে করে। তারা সামাজিক অনুশাসনের নামে অত্যাচার নির্যাতনের নানা রকম বিধি তৈরি করে থাকে। শাসন ক্ষমতার জোরে সামাজিক কাঠামো তাদের পদানত বলে মনে করে। কারণ প্রজন্মান্তরে তারা শিরায় প্রবাহিত রক্তের আলোকে নিজেদের বংশগর্বে বলীয়ান

ভাবতে শেখে, নির্যাতনের নানা নতুন কৌশল আয়ত্তে আনতে শেখে। এমনকি তারা যখন শারীরিকভাবেও অসহায় হয়ে ওঠে তখনও তারা পূর্ব পুরুষের পুঁজির কারণে অভাবিতভাবে বেড়ে ওঠা শৌর্য বীর্যের কারণে নিজেদের শক্তিশালী ভাবে। *..........বুড়ো গালাগালি করার সময় তিনশো বছর আগের ইউসুফ কাজীর রক্ত শিরায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাইশ গ্রামের জায়গিরদারি স্বভাব মাথাচাড়া দেয়। অথচ লোকটা অসহায়– চরম অসহায়।*[14]

সূর্য তুমি সাথী উপন্যাসে *খলু মাতব্বর* একটি উদীয়মান সামন্তবাদী চরিত্র। সে তার সামনের পথের কাঁটা মনে করে কাজী পরিবারের লোকজনকে। সে জমি দখল করতে চায়, সে পারিবারিক প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা চায়। *বুড়োকে নাজেহাল করার জন্যে খলু মাঝে মাঝে এধরনের ইতরামো করে থাকে। কেউ কিছু কিনতে এলে ক্রেতাকে বুড়োর কাছে পাঠায়। এ করে খলু এক ধরনের আনন্দ পায়। এরকমভাবে লজ্জা দিয়ে কাজী বাড়ির সাত পুরুষের ঐতিহ্যে আঁচড় কামড় কাটে।*[15] *খলু* প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমাজ কাঠামো, সামাজিক নিয়ম, আইন-আদালত পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে চায়। অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আপন আস্তিনের তলায় নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করার চেষ্টা করে এবং কখনও কখনও পারেও। কারণ শাসন কাঠামোর অন্তর্কাঠামোটাই বলশালীদের গোলাম হয়ে থাকার মতো করে তৈরি। নব্য পুঁজিবাদী চরিত্র হিসাবে *খলু মাতব্বর* পুরাতন পুঁজিবাদী কাজী পরিবারকে সহ্য করতে পারে না বলে কটাক্ষ করার চেষ্টা করে যায় নিরন্তর।

কবীরের বাপ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বড় পারিবারিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তার ছেলে মারা গেছে, ছেলের বউ বাড়ি থেকে চলে গেছে আর সামান্য যে জমি ছিল তাও *খলু মাতব্বর* জোর করে দখল করে নিয়েছে। *বুড়োর কথা কওয়া ছেলেকে যম নিয়ে গেছে। আরেকটি বোবা ছাওয়াল ছিল। কথা কয় না। চাহিদামতো ধান দিত, মরিচ দিত। কালো হীরে মাটি তার বোবা ছাওয়াল।*[16] বুড়ো *কবীরের বাপ* কোনোমতেই মেনে নিতে পারে না যে, তার জমিটা অন্যে দখল করে নিয়েছে। সে তার জমিটাকেও নিজের পরিবারের সদস্য বলেই মনে করত। সে তাই তাকে *বোবা ছাওয়াল* বলে অভিহিত করেছিল। পরিবারের একটি সদস্য যেমন পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে তেমনি বুড়োর এই বোবা ছাওয়ালও পরিবারের চাহিদামতো ধান, মরিচ উৎপাদন করে দিত। নব্য সামন্তীয় চরিত্রের অধিকারী *খলু মাতব্বরে*র দখলী মনোভাব জানাতে লেখক চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সামন্তবাদী চরিত্রও কখনও কখনও পরাজিত হয়। যখন শাসকের অত্যাচার লাগামহীন হয় তখন নির্যাতিতেরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করলে শাসকের লাগাম আলগা হয়ে যায়। এমনি এক কৃষক সমিতির কথা লেখক এই উপন্যাসে বলেছেন। *মনির আহমদ, হিমাংশু ধর, মান্নান প্রভৃতি চার-পাঁচজন মাতব্বরকে ডাকতে ডাকতে বৈঠকখানায় এল। এরা কৃষক সমিতির মানুষ।......... এই কৃষক সমিতিই মাতব্বরের লাভজনক বহু অভিসন্ধিকে ভন্ডুল করে দিয়েছে। মফিজার মা'র ভিটেটুকু বলতে গেলে খলু একেবারে একরকম পানির দামেই কিনে নিয়েছিল। কিন্তু মনির আহমদই চাঁদা তুলে মফিজার মা'র মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।*[17] পুঁজিবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনো একজন পুঁজি বিরোধী ক্রিয়াশীল চরিত্র যথেষ্ট নয়। 'দশের লাঠি একের বোঝা'র মতো পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে তা সমবেতভাবেই করা উচিত। কারণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ লাভের আগে সমাজ ও শাসন কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে পুঁজি। সর্বভূক পুঁজি সামাজিক বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করে না। দখলী মনোভাবাপন্ন এক অমোঘ শক্তি বলে অবলীলায় দখল করে সহায় সম্বলহীন অসহায়ের অন্ধের যষ্টি। লেখক এমন চরিত্রগুলিকে *খলু মাতব্বরে*র ছায়ায় উপস্থাপন করেছেন। আবার তিনি অন্যায় প্রতিকারের মাধ্যম ও উপায় সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করেছেন।

সামাজিক ইতিহাস মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের সময় সুফি-দরবেশগণের প্রভাব বেশি ছিল। সাম্যবাদী মনোভাবের কারণে সকলের মনযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তারা এবং সকলেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এসব সুফি সাধকগণ এদেশে পীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পীর দরবেশের প্রভাব সম্পর্কে লেখক পাঠকদের জানিয়েছেন। *এককালে অনেকেই তার বাপের মুরিদ ছিল। পীর মুরিদের প্রতি টান উঠে গেলেও অনেকে ফয়েজকে এখনো সমীহ করে। অবশ্য তারা বুড়োবুড়ি। হাল জমানার চ্যাংড়ারা ফয়েজকে পরোয়া করে না।*[১৮] সামন্তীয় ঘরানার পুঁজিবাদী শক্তি যখন সমাজ কাঠামোকে নিজেদের আয়ত্তে আনার মাধ্যমে ধর্মকেও পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে তখন ধর্ম পালনকারী ও মান্যকারী ব্যক্তিবর্গও তাদের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ফলে শান্তির বার্তাবাহী ধর্মও পুঁজির করাল থাবায় আটকে পড়ে। এমনিভাবে ধর্মবেত্তা ব্যক্তিগণ ও তাদের উত্তরসুরি যাদের সামাজিক সম্মান আছে তারা পুঁজির ঘেরাটোপে শাসকের খাঁচায় বন্দী হয়ে পড়ে। পুঁজিপতিরা ব্যবহার করে তার ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক সম্মান। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যারা ধর্মভিত্তিক পুঁজিবাদের কালো থাবা সম্পর্কে জানেন তারা আর পীর ফকির মানেন না। লেখক এই উপন্যাসে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণের প্রয়োজনে লেখক পুরো উপন্যাসে কয়েকটি সামন্ত নির্ভর পুঁজিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এসব চরিত্র সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছ করে জীবনের রস চুষে খেতে চেয়েছে। চরিত্রগুলি নিজেদের বানানো নিয়মকে সামাজিকতার প্রথা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি আধিপত্যবাদী চরিত্রের প্রয়োজনে মানুষকে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার আদলে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। *জাহেদ বকসু তাকে দাস করতে চায়। দাস বিয়ে-শাদিতে হাত ধুয়ে দিলে টাকা পায়, বাতাসার হাঁড়ি বয়ে নিলে টাকা পায়। সপের একপাশে বসে কুকুর বেড়ালের মতো খেতে পায়। তার বাপ কাজী বাড়ির দাস ছিল, এখন তার বাপ বেঁচে নেই।*[১৯] উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র *হাসিম* মনোগতভাবে উদার বলেই পুঁজির বিরূদ্ধে তার লড়াই। কিন্তু সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রতিভু শাসক কর্তৃপক্ষ *জাহেদ বকসু* দাস বানাতে চায় *হাসিম*কে কারণ তার বাবা কাজী পরিবারের বাড়িতে কাজ করত। কিন্তু *হাসিম* দাসবৃত্তির বৃত্ত ভাঙতে চায়, সে আধিপত্যের ঘেরাটোপ ছিন্ন করতে চায়।

পুঁজিবাদী চরিত্র যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা কাঠামোকে নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। কারণ শাসন ক্ষমতার দণ্ড যার হাতে থাকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতাও তার হাতেই থাকে। *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসে *খলু মাতব্বর* থানার দারোগার যৌন লালসা চারতার্থের জন্য নিজের পরিবারের মেয়ে *জোহরা*কে বাধ্য করেছে। পুঁজির নেশায় বুঁদ *খলু মাতব্বর* সামাজিক সভ্যতাকে গণ্য করেনি। সে শুধু নির্বিঘ্নে জমির দখল চেয়েছে, প্রতিপত্তি-সম্পদ বাড়াতে চেয়েছে। কিন্তু এসবেরেই সাক্ষী হয়েছে *হাসিম* যার রা শব্দটি করার সামাজিক ক্ষমতাও নাই। কিন্তু *হাসিম জোহরা*র মতো নির্যাতিত হলে প্রতিবাদ করার শক্তি রাখে। সে *তেজেন*এর ঝুলন্ত শরীর থেকে শপথের মন্ত্র আওড়ে নেয় আপন মনে যা শেষ পর্যন্ত তাকে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে। *চিন্তার অতন্দ্র প্রহরীরা তাকে ঘিরে ধরেছে। একপাশে হুঁকোটা রেখে দেয়। মাথাটা ঝিম ঝিম করে। বাইরে সূর্যের ঝলমলানো রোদে হাসিম তেলিপাড়ার তেজেনের ছুরির ফলার মতো বাগিয়ে ধরা দুচোখের দৃষ্টিকে দেখতে পায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভগ্নাংশ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।*[২০]

পুঁজিপতিরা সমাজকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু করা খুবই কঠিন। *জিনিসপত্রের দাম ভয়ংকরভাবে বাড়ছে। হাজেরার ছোট আট বছরের ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। মরে গিয়ে বেঁচেছে। কানা আফজল, জাহেদ বকসু, অধর বাবু আর খলু মাতব্বরদের জগতে*

হাজেরার ছেলেদের বাঁচবার ঠাঁই কই?[২১] পুঁজির আধিকারিকগণ সামাজিক আইন-কানুন তৈরি করা থেকে সামাজিক প্রথার অপব্যবহার, সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণভার, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ, সামাজিক গতিশীলতার ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ এবং মানবিকতার গুণাবলি ক্ষুণ্নকারী বিষয়সমূহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজস থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী উপাদান পর্যন্ত সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সমাজে নানা নামে ও নানা পেশায় তারা আবির্ভূত হলেও তাদের আপেক্ষিক উদ্দেশ্য আসলে একই। তারা সবাই সমাজের দুঃস্থ মানুষের রক্ত চুষে নিতে চায়। লেখক *হাজেরার ছেলে, কানা আফজল, জাহেদ বকসু, অধর বাবু* ও *খলু মাতব্বর* চরিত্রের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

লেখক পুঁজিবাদী চরিত্রগুলিকে অত্যাচারের কৃপাণ চালাতে দেননি সারা জীবন। তিনি যেমন প্রতিবাদী চরিত্র তৈরি করেছেন তেমনি নির্যাতিত চরিত্রগুলির সাহায্যকারী সংগঠনও তৈরি করেছেন। ফলে ঔপন্যাসিক শুধু যে সমস্যার আবর্তে পাক খেয়েছেন তাই নয়, তিনি সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও বাতলেছেন। *আওয়াজ তুলল চন্দ্রকান্ত। প্রথমে হাসিমের গলাটা কেঁপে উঠল।.... গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করল:*

জালেম গোষ্ঠী ধ্বংস হউক
চাষী-মজদুর ভাই ভাই
অন্ন চাই বস্ত্র চাই
লাঙ্গল যার জমি তার।[২২]

উপন্যাসে দেখা যায় প্রতিবাদী *হাসিম* চরিত্র গলা উঁচু করে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্লোগানে নিজেকে সামিল করতে পেরেছে। নির্যাতিত নিপীড়িতের পক্ষে আওয়াজ তুলে চন্দ্রকান্ত মানবতার পক্ষে এক কালজয়ী যুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।

একজনের শ্রমলব্ধ সম্পদ অন্যজনের নিজের মনে করা এবং সেই সম্পদের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় পাকাপোক্ত আসন তৈরি করে নেয়ার প্রবণতা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এমনকি শ্রম চুরির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণিকে শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পদানত করে রাখাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। *মানুষ মানুষের মেহনত চুরি করে মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে। কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুন-ঝরা মেহনত চুরি করে ধনী হয়েছে মানুষ। মেহনতি মানুষের বুকের তাজা রক্ত তাদের বাগানে লাল গোলাপ হয়ে ফোটে। সহস্র রকম পদ্ধতিতে বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে।*[২৩] ঔপন্যাসিক *আহমদ ছফা* নিজে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চেতনায় বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের ধনাত্মক কথা না বললেও পুঁজিবাদের ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলী উপস্থাপন করেছেন। যে শ্রমিক শ্রেণির শ্রমে ও ঘামে সভ্যতার উপাদানগুলি আকাশ ছোঁয়া হয়ে মাথা তোলে সেই শ্রমিক শ্রেণির শ্রম চুরির কথা তিনি তাঁর উপন্যাসে বলেছেন। তিনি চুরি করা শ্রমের রূপকার্থে লাল গোলাপ ফুল ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসে লেখক শুধু পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যাবলী বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রতিবাদের কল্পনা করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অত্যাচারের যে রকমফের আছে তা আলোচনা করে লেখক ব্যথিত হয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, কোনো একদিন কোনো বা এক সময় নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করবে। কারণ তাদের রক্ত শুষে শুষেই তৈরি হচ্ছে পুঁজির শক্ত দেয়াল যা ভেদ করে কখনোই অত্যাচারিতের কান্নার শব্দ পৌছাবে না অত্যাচারীর কর্ণ গহবরে। *বেবাক দুনিয়া ভরা শোষণ, শোষণে রক্ত নাই, হাড্ডিত*

ঠেকাইয়ে আনি। এত শোষণে তবুও মাইনষের ঘুম ন ভাঙ্গে ক্যা?[২৪] সাধারণ মানুষ যারা শ্রমিক শ্রেণির লেখক তাদের প্রতি অমোঘ আস্থা রাখতে চেয়েছেন। কারণ যারা সভ্যতা তৈরি করতে পারে তারাই সভ্যতা ভাঙতে পারে। তাই তিনি শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা রেখেছেন যে, তারা যেন একসময় ঘুম ভেঙে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে পারেন যার সাহায্যে ভেসে যেতে পারে অত্যাচারী শাসকের শোষণের অট্টালিকা, যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম পায় এক শোষণহীন সমাজ অবয়ব যার কাঠামো নির্মিত হবে শ্রম ও শ্রমিকের সন্নিবেশে।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষদের উদ্বুদ্ধকরণে লেখক গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনি সংগ্রাম মুখর জীবনের আধিকারিকদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণে সংগ্রামকে সুখের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সুখ অর্থে সংগ্রামকে বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রমিকের জীবনের সামনের দিনগুলিকে আশার প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ মানুষের আশার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনা যুক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ তার স্বপ্ন পূরণের নেপথ্যে কাজ করে যায়। *জীবনের সুখ মানেই তো জীবনের সংগ্রাম। সামনের উজ্জ্বল আশা আর পেছনের উদ্দীপনা না থাকলে মানুষ পারে না সংগ্রাম চালিয়ে যেতে।*[২৫] লেখক অতীত জীবনের কর্ম চঞ্চলতাকে উদ্দীপনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ভেবেছেন যে, সংগ্রামে ভালো ফলাফল লাভ করতে হলে অবশ্যই একটি সংগ্রামী স্বপ্ন ও উদ্যমতার অতীত ইতিহাস থাকতে হবে। তাই তিনি সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা পুঁজির দাসত্বকারী অর্থলোভী শ্রেণিকে একটি চরিত্রের সাহায্যে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাদের সকলকে বলেছেন *অত্যাচারী*। কারণ যে-কোনো প্রকারেই হোক শ্রমিক নির্যাতনই তাদের মূল কথা। অর্থনৈতিকভাবে তাদের পরিচয় হল যে তারা মুনাফাখোর, অনেক অর্থের মালিক, প্রাচুর্য তাদের পায়ের তলায় লুটায়। সামাজিকভাবে তারা পুঁজির কারণে সম্মানের পাত্র, এমনকি কখনও কখনও সামাজিক প্রভুও। রাজনৈতিকভাবে তারা নেতা কারণ পুঁজির সাহায্যে যে শ্রমিকের শ্রম চুরি করে সেই শ্রমিককেই আবার অবৈধকাজে ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। ধর্মীয়ভাবে নামে মাত্র ধর্ম পালনকারী, কিন্তু কোনোভাবেই ধর্মের মূলানুগ বৈশিষ্ট্য পালনে সমর্থ নয়। *ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা একজাত– অত্যাচারী।*[২৬] উপন্যাসে লেখক শোষণকারী ব্যক্তিবর্গের ধর্ম পরিচয়কে কটাক্ষ করে তাদের জাত পরিচয় অত্যাচারী বলে নির্ধারণ করেছেন।

ধর্মকে পুঁজি বানিয়ে যারা ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে চায় তারাও আসলে পুঁজিবাদীদের দলে। মানুষের জীবন চালনাতে যে ধরনের সমস্যা তৈরি হয় তার সমাধান সামাজিকভাবেই সম্ভব। এমনকি সাধারণত মানুষের যে সকল শারীরিক সমস্যা তৈরি হয় সেগুলিও মানুষই পারে নিরাময় করতে। এর কোনোটি শুশ্রুষার মাধ্যমে আর কোনোটি ঔষধের মাধ্যমে। তারপরও এমন কিছু রোগ রয়েছে যেগুলি আসলে কোনো রকমেই নিরাময় করা সম্ভব নয়। আস্তিকেরা এসকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থাশীল। কিন্তু ধর্ম ব্যবসায়ী লোকজন ধর্মীয় গল্পের আদলে কিছু উদ্ভট অবিশ্বাস্য গল্প তৈরি করে এবং তা প্রচারের মাধ্যমে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করে। ধর্ম ব্যবহারকারী এসব আধিপত্যবাদীদের সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন- *.....সুন্দর সুন্দর গল্প বানাতে পারে বলে মোল্লারা খেতে পায়। ওসব কিছু নয়, ভাঁওতা। মুরগির রান খাওয়া আর মেহনতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এসব মোল্লারা বানিয়েছে।*[২৭]

মানুষ হিসাবে একজন মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যবহারে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষের মধ্যে মানবিকতার বোধ তৈরি করা। *টাকা-পয়সা বিত্ত বৈভবে মানুষের সত্যিকার পরিচয় ফোটে না। মানুষের পরিচয় অন্য কোনো কিছুতেই প্রকাশ পায়।*[২৮] অনেক লেখাপড়া শেখা *কানা আফজলের* বড় ছেলের মধ্যে কোনো মানবিকতার বোধ তৈরি হয়নি বলে লেখক আক্ষেপ করেছেন। আবার *মনির আহমদের* মতো সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যে সমবায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালুর স্বপ্ন দেখেন, সে কখনো *হাসিমকে* তার বাবার জাত পরিচয় দিয়ে পরিচিত করেন নি। তিনি সব সময় *হাসিমকে* একজন সহযোদ্ধা, নিবেদিত প্রাণ সহকর্মী হিসাবে বিবেচনা করেছেন। সমিতির সদস্য হয়ে *হাসিম* অনুভব করতে শিখেছে যে, মানুষের উপকার করা, অন্যের বিপদে সহযোগিতা করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য যা শিক্ষা লাভেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে হাসিম আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করে। সে সম্পদশালীর সঙ্গে নিজের তুলনা করে বুঝতে পারে যে সম্পদের বিবেচনায় তার অবস্থান নিচের দিকে। এমনকি সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য গঠিত সমিতিতে আরও যারা একতাবদ্ধ হয়ে গ্রামের ওলাওঠাদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে তাদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা প্রায় *হাসিমের* মতোই। *সকলেই হাসিমের মতো খেটে খাওয়া মানুষ। কর্মীদের সকলেই গরিব। কারো এক-আধ কানি জমি আছে–কেউ ভাগচাষি। আবার অনেকে অপরের জমিতে মজুর খাটে।*[২৯] মানুষের জন্য মানুষের উপকার করার প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধু শুভ মানসিকতাই সামাজিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হতে পারে। *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসে *আহমদ ছফা* সে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। *আহমদ ছফা* সম্পর্কে জানা যায়, *তার ভেতর সব সময় দু'টি সত্তা সক্রিয় ছিল– একটি লেখক সত্তা, অপরটি মানবিক বোধের সত্তা। তিনি কখনোই লেখার জন্য লেখেননি, সাহিত্য সাধনা করেছেন জীবনের ব্রত হিসেবে। ভেতরের দ্রোহ ও যন্ত্রণাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে মেলাতে চাইতেন। এ-কারণে তাঁর প্রতিটি লেখাই তীব্রভাবে রাজনৈতিক; আবার তা শিল্পগুণে উত্তীর্ণ।*[৩০]

উপসংহার

সমাজ কাঠামোর পরতে পরতে অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক নির্যাতন, ধর্মীয় বিভেদ আর সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের ধারণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সমাজ সংস্কারকেরা এসকল বিভেদের কাঠামোবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কখনও পেরেছেন কখনও বা পেরে উঠেননি। কারণ, সমাজে অত্যাচারীরা হয় বেশি শক্তিশালী না হয় অত্যন্ত ক্ষমতাধর। তাদের দমন করা বা উৎখাত করা বড় কঠিন কাজ। তারপরও অত্যাচারীর শোণিত কৃপাণ যে খুনে রঙিন হয় তা-ও এক সময় থামতে বাধ্য হবে যখন তা প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে।

সূর্য তুমি সাথী উপন্যাসের লেখক *আহমদ ছফা* আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আশা করেছেন। কারণ *উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।*[৩১] কিছু চরিত্রের সাহায্যে বাস্তবানুগ সমস্যাগুলিকে সংলাপের আকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখক যে প্রয়াস পেয়েছেন তা শিল্প বিচারে সার্থকতার দাবিদার এবং ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্বকেও সমর্থন করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ সফিকুন্নবী সামাদী, *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা: শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ*, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২।

২ র‍্যালফ ফক্স, The Novel and The People, বদিউর রহমান (অনূদিত), *উপন্যাস ও জনগণ*, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা: প্যাপিরাস,২০০৫), পৃ. ১৭।

৩ পুরনজিত মহালদার, *আহমদ ছফার কথাসাহিত্য*, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র (রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬), পৃ.১৬ ।

৪ নাসির আলী মামুন, আহমদ ছফার সময়, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা: শ্রাবণ,২০০৫), পৃ. ৪৪।

৫ রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ৩১।

৬ আহমদ ছফা, *উপন্যাস সমগ্র*, ৪র্থ মুদ্রণ, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ২১।

৭ *তদেব*, পৃ. ২০।

৮ *তদেব*, পৃ. ১৯।

৯ *তদেব*, পৃ. ২৯।

১০ *তদেব*, পৃ. ৩০।

১১ *তদেব*, পৃ. ৩৩।

১২ *তদেব*, পৃ. ৩২-৩৩।

১৩ *তদেব*, পৃ. ৩৯।

১৪ *তদেব*, পৃ. ৩৯।

১৫ *তদেব*, পৃ. ৪০।

১৬ *তদেব*, পৃ. ৪৩।

১৭ *তদেব*, পৃ. ৪৬।

১৮ *তদেব*, পৃ. ৪৩।

১৯ *তদেব*, পৃ. ৫৪-৫৫।

২০ *তদেব*, পৃ. ৫৬।

২১ *তদেব*, পৃ. ৫৬।

২২ *তদেব*, পৃ. ৬১।

২৩ *তদেব*, পৃ. ৬১।

২৪ *তদেব*, পৃ. ৬২।

২৫ *তদেব*, পৃ. ৬৩।

২৬ *তদেব*, পৃ. ৬৫।

২৭ *তদেব*, পৃ. ৬৪।

২৮ *তদেব*, পৃ. ৭৯।

২৯ *তদেব*, পৃ. ৭৯।

৩০ সোহরাব হাসান, ‘আমাদের ছফা ভাই’, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.) *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ*, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৩৮।

৩১ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ৭ম সংস্করণ, (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ.১।